



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 236 - 246

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে চিকিৎসক চরিত্র : একটি বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন

আঞ্জু মনোয়ারা বেনজির চৌধুরী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Email ID: anjuchoudhury05@gmail.com

 0009-0005-2812-3605

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Life,
originality,
oppression,
soul.

Abstract

Banaful is a unique talent in the realm of Bengali literature. He was the very first in Bengali literature to write a novel based on a doctor's life. His first novel is 'Trinakhandha' (A Piece of Grass). Utilizing his real-life medical experiences as the material, he emerged with great originality in the role of the novel's protagonist. From the practical viewpoint of his personal medical life, the author vividly portrayed the tension, helplessness, oppression, and confusion of the unbalanced minds of ordinary middle-class people in 'Trinakhandha'. This novel does not contain the story of any soul; rather, it is written in a first-person, confessional style.

Discussion

বাংলা সাহিত্য জগতে বনফুল এক অনন্য প্রতিভা। তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে প্রথমেই ডাক্তারি জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’। এই উপন্যাসের কাহিনিগুলি ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপকরণ করে তিনি উপন্যাসের নায়কের ভূমিকায় স্বকীয়তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ডাক্তারি অভিজ্ঞতার বাস্তবিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের ভারসাম্যহীন চরিত্রের উদ্ভেজনা ও অসহায় নিপীড়িত বিভ্রান্তির কথা লেখক ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসে কোনো আত্মার কাহিনি নেই বরং উপন্যাসটি আত্মকথন ভঙ্গিতে লেখা। তাই কবি মোহিতলাল মজুমদার ‘তৃণখণ্ড’ পড়ে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে বলেছেন –

“ ‘তৃণখণ্ড’ পড়িলাম - এক নিঃশ্বাসে। পড়িবার সময় শীঘ্র শেষ না হয় এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের আত্মচরিত বা আত্মপরিচয় যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই বইখানি এত চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে।”

অর্থাৎ - ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি পড়ে মোহিতলাল মজুমদার ‘তৃণখণ্ড’ কে গল্পের অধ্যায় ভূষিত করেছেন।

বনফুল সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন, কেননা তিনি নিজে একজন ডাক্তার ছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায় অবহেলিত মানুষের জীবনচিত্র অংকিত হয়েছে। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি ভাগলপুরের

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা নিয়েই রচনা করেছেন। আবার তার পাশাপাশি বিহারের আদিম জনজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা যায় তিনি ডাক্তারি করতে করতে যেসব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পরবর্তীকালে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। এই চরিত্রগুলির মধ্যে মোতিহারীর বিহারী ব্রাহ্মণ, চাকর ভজুয়া, বেশ্যা আসমানী, পাঁচুগোপাল বসাক, হরিশবাবু, কারুগোয়ালা, তেজস্বী ক্ষত্রিয় রামবরণ সিং, যক্ষারোগী বংশীমিত্র, রানীজি, কুঞ্জলাল সকলই যেন ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচিত বাস্তব সমাজের মানুষ।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় তথা নায়ক চরিত্র ডাক্তার। তবে এই জনৈক চিকিৎসক চরিত্রটি যেন শিল্পী বনফুলের ব্যক্তিগত জীবনের-সন্ধানীর অভিজ্ঞতার ফসল। বনফুলের প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি সাহিত্য জগতে বনফুল ছদ্মনাম নিয়ে আবির্ভূত হলেন। বনফুল তথা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন। তাই চিকিৎসক বনফুল নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের প্রথমে নিজেই বলেছেন –

“আমি ডাক্তার, আমি কবিও। আমার জীবন-কাহিনী যদি শুনতে চান, তবে আমার কবিতাও পড়িতে হইবে। তাহাই আমার জীবনের সত্য প্রকাশ।”^২

কেবলমাত্র ডাক্তার বা সাহিত্যিক হিসেবে লেখক বনফুল সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তিনি কবিও ছিলেন বটে। প্রকৃতপক্ষে বনফুলের শিল্পীমন ছিল স্বভাবতই সমাজসচেতন। তিনি বাস্তব জীবনে সংসার জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে চিকিৎসা পেশার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছেন বিচিত্র মানুষের জীবন। ফলে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ‘তৃণখণ্ড’ নামে গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত একটি উপন্যাস রচনা করে পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরলেন। উপন্যাসের মধ্যে জনৈক ডাক্তার কখনো কবিতার মাধ্যমে নিজের মনের আকুতি উদ্বেলিত করেছেন আবার কখনো বাস্তব চরিত্রের ভিড়ে এসে তাদের কাহিনিকে গল্পের আকারে ঘটনার কাহিনিকে বিবরণ করেছেন। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের প্রথমেই দেখা যায় জনৈক ডাক্তার কবিতার মাধ্যমে নিজের মনের প্রলাপের আতর্নাদ ব্যক্ত করে বলেছেন –

“মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি, কি ক’রে প্রকাশ করিব বল না-কিছু না জানি, গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি, বুঝাব কি ক’রে সাগর-জলের জ্বালার বাণী।”^৩

কবি প্রেমে পড়েছেন উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। তিনি প্রিয়তমার সন্ধান পেয়েছেন বলে মনের আকুতি এবং বেদনাময় অনুভূতি যেন তাকে বলতে চান। এখানে দেখা যায় কবি যেন কল্পনাপ্রবণ প্রেম মরীচিকা নিয়ে ডাক্তারের জীবন স্রোতে তৃণখণ্ডের মতো নিজেকে ভেসে নিয়ে চলেছেন। তাই ক্ষণকালের স্বল্পআকারে ভাবপ্রবণতা নিয়েই উপন্যাসে কাহিনীর পরিকাঠামো ব্যক্ত হয়েছে।

আসলে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার ফলে তৃণখণ্ডের মতো নিজেকে ভাসিয়ে দিতে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তিনি প্রথম জীবনে কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। সেইজন্য পরবর্তী সময়ে যখন উপন্যাস রচনা করেন তারমধ্যে কবিতার প্রভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমাদের আলোচ্য প্রথম ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটিতে কবিতা ও গল্প আকারে মিশ্রিত উপন্যাসের আভাস দেখা যায়। এখানেই বনফুলের অভিপ্রায় স্পষ্টই সিদ্ধহস্ত। তিনি কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস হোক না কেন, তিনি সেগুলির মধ্যে নামের সঙ্গে ব্যক্তি, স্থান, সময় ও ঘটনার পুরো বিষয় তার সৃজনপ্রতিভার মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি একটি ডাক্তারের জীবনকাহিনি এবং তাকে ঘিরেই কিছু খণ্ড বিচ্ছিন্ন রক্তমাংসের মানবিক প্রতিকল্প একই সূত্রে কাহিনীর ঘটনামালার বিবরণ। তাই এই উপন্যাসটিতে কাহিনীর রসের বিপরীতে সৌন্দর্যের চিত্রময়তা প্রাধান্য লাভ করেছে। উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে একজন প্রেমে পড়া ডাক্তারের প্রেমশক্তি অনুভবের প্রলাপের কবিতা দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন চরিত্রের আগমন ও নানা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রোগীর স্ববিরোধ প্রবণতা ও আত্মগ্লানির করুণ আতর্নাদ অভিব্যক্ত হয়েছে। বনফুলের ব্যক্তিজীবনে অনুভব করেছেন জীবনকে চলমান প্রবাহ রূপে। তাই তিনি জীবনের সবকিছু চলমান স্রোতে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে চলেছে। আসলে তিনি যাপিত দিনগুলিতে দেখেছেন জীবনের ভাসমান স্রোতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন অসহায় প্রাণের চিত্রকল্প। তাই চিকিৎসক বনফুল ‘তৃণখণ্ড’ র কাহিনিতে ডাক্তারের ভূমিকায় দাঁড়িয়েই মানুষের অসহায়তা অনুভব করে বলেছেন –

“মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই। অথচ মধ্যমান মজ্জমান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে। ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি-ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে।”^৪

উপন্যাসটি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যাবে, ‘তৃণখণ্ড’ বনফুল চিকিৎসা পেশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন মানুষের ব্যাধির অসংগতিরূপ। কখনো তিনি উপলব্ধি করেছেন গনোরিয়ায় আক্রান্ত রোগগ্রস্ত স্বামীর কারণে সন্তানহীন স্ত্রী উন্মাদ হয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। কখনো দেখেছেন প্রৌঢ় প্রাণকৃষ্ণ প্রেমের মোহ-জালে তরুণী মেয়ের প্রতি অসঙ্গত কাম উন্মত্ততা, কখনো দেখেছেন হরিশবাবু বিগত যৌবন লাভের তীব্র কামনা আবার কখনো দেখেছেন রসুলপুরের রক্ষণশীল পরিবারে ব্যভিচারের চূড়ান্ত। এখানে বনফুল ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে বাস্তব সমাজের চিকিৎসকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে দেখেছেন মানুষের পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ‘তৃণখণ্ড’ র মতো ভেসে চলেছে। এছাড়া বনফুল লক্ষ করে চলেছেন জীবনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ। তাঁর পেশা শুধু চিকিৎসা করা ছিল না, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচয় পাওয়া যায়। বনফুলের চেতনসত্তায় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ভাসমান কাবুলিওয়ালা থেকে উকিলবাবু, গোয়ালা থেকে মহিন্দর, হরিশবাবু, ঝাঁকড়াভুরু, রানীজী থেকে আসমানী প্রভৃতি সাধারণ মানুষের চরিত্রগুলির অনতিস্পষ্ট অংশগুলিকে লেখক প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক শিল্পীপ্রাণের আন্তরিকতাবোধের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের সম্যক পরিচয় লাভে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় জীবন রহস্যেরও ব্যাপক জীবনের চিত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাবল্যে যুক্তিনির্ভর মননের দ্বারা সমাজের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন তা অস্বীকার করা যায় না। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লেখকের ব্যক্তিসত্তার মানসপ্রতিক্রিয়া ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্যের সন্ধানই ছিল উপন্যাসের নায়ক তথা লেখক বনফুলের উদ্দেশ্য। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের ডাক্তার চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কল্যাণের জন্যই চিকিৎসা করা এবং তাদের মধ্যেই বেঁচে থাকার আকুলতা নিয়েই তার চরিত্রের সার্থকতা। উপন্যাসের কাহিনি ক্ষীণ হলেও কোনো নগণ্যতার প্রকোপ ঘটেনি। বাংলাসাহিত্য বা ইউরোপীয় যেকোনো সাহিত্য বহুমুখী সমস্যা ও জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে নর-নারীর প্রেমের কথা বহুবার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নর-নারীর প্রেমের কথা বর্ণিত হলেও তা স্বকীয়তা পূর্ণতা পায়নি। তাঁর উপন্যাসগুলি বাস্তব প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত। তিনি উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন সংকটপূর্ণ পীড়িত মানুষদেরকে। সেদিক থেকে বিচার করলে বনফুল হৃদয়হীন মানুষ নন। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে লেখকের প্রেমিকসত্তার কিছুটা আলোড়ন দেখা যায়। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি বনফুলের ব্যক্তিগত চেতনার অভিজ্ঞতার চিত্রকল্প। তাই এই উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে নারীর মধ্যে ভালোবাসার সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। উপন্যাসে ডাক্তার কল্পনার মোহবেশে নারীর মধ্যেই ভালোবাসার তৃষ্ণার সন্ধান করেছেন। আসলে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে লেখক তথা জনৈক ডাক্তার যে নারীর মোহিনীমূর্তির কল্পনা করেছেন সেটা স্বপ্ন। তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিন্তাভাবনার মোহজাল। কিন্তু সে নারী রক্তমাংসের কোনো মানুষ নয়। এছাড়া এটাই বলা যেতে পারে লেখকের এই নারীর প্রতি যে তীব্র কামনা সেটা হয়তো বাস্তবে কোনো মানবী নয় বরং মিথ্যা বলা সম্ভব নয়। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে লেখক নিজেকে আঘাত করতে দ্বিধা করেননি তিনি। বরং তিনি উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে ‘পরস্ত্রী’ প্রতি আসক্ত বলে ‘ধিক্কার’ জানিয়েছেন। আবার ক্ষণকাল থেমেও বলেছেন সে পরস্ত্রীও নয়, স্ত্রী বটে। তবে আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজমান করে সে আমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। সে তার অন্তর্যামী জুড়ে মধুর বেদনাময় অনুভূতির দ্বারাই সমস্ত হৃদয়ে আলোড়িত হয়ে আছে। এবং কবি তথা জনৈক ডাক্তার তা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন –

“অন্ধকারে আঁখি মুদি দেখিতেছি তাহার স্বরূপ নাই কোন ছদ্মবেশ আর, নয়ন - সম্মুখে তার সত্যমূর্তি
জাগে অপরূপ, আলো তারে দিল অন্ধকার।”^৫

কবি যেন অন্ধকার নির্জন রাত্রিতে তাঁর প্রেমিকার স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন। তার হৃদয়ের বেগ তীব্রতর হয়ে ওঠেছে, সে যেন তার প্রেমিকার নিশ্বাসের স্পর্শ যেন তার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করেছে। আবার পরক্ষণেই দেখা যায় সেই প্রেয়সী যেন তাকে অস্বীকার করে বলেছে দিনের আলোকশিখায় আমি তো তোমার কেহ না, আমি তখন এই বড়

সমাজ-সংসারের একজন। তারপর দেখা যায় সে তাহার আলোলায়িত চুলগুলোকে ডাক্তারের ঢাকাপূর্ণ সমস্ত দেহ থেকে সরিয়ে উঠিয়ে দাঁড়িয়ে চলে গেল এবং ডাক্তারের হৃদয়ে প্রলাপ কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে –

“এ জীবনে হাসিয়াছি বহুদিন মন-প্রাণ ভরি, বাকি আছে এখনো কাঁদার-।”^৬

ডাক্তারি করিয়া যখন নায়ক বাড়ি ফিরলেন তখন তার মনের মধ্যে দ্বিচারিতার প্রকোপ দেখা যায়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যাকে কোনোদিন আমি দেখি নাই, তাহার হাসি, ছলনা, লজ্জা লইয়া তিনি যে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন সে হয়তো আমাকে মোটেই ভালোবাসে না। প্রাণকৃষ্ণবাবু পাশের বাড়ির মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, মেয়েটি যেভাবে তাহার প্রেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজানা, ঠিক হয়তো আমিও তাহার মতো নির্জন অন্ধকার রাত্রির অন্ধ প্রেমের আশ্রয়ে নিজেকে উদাসীন করে রেখেছি। আবার দেখা যায় নায়ক ডাক্তার যখন নিঃসঙ্গ বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন তখন তাহার উচ্চাসপ্রবণ ভাবালুতাকর প্রকোপে অন্তর্যামী থেকে যেন স্বীকার করে না নায়িকা যে তাকে ভালোবাসে না। তখন তার উদাসীন মনের প্রেম নিবেদন ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে –

“তোমার স্বপন আমার নয়নে আঁকিয়া, সুখ পাও কেন আড়ালে লুকায়ে থাকিয়া, ওগো, বল না।”^৭

তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল লক্ষণই হল সুতীর প্রেমের মুক্তি-পিপাসা। এখানে স্পষ্ট দেখা যায় উপন্যাসের নায়ক চিকিৎসক দুজনই একে অপরের পরিপূরক। কবি যেন তার প্রেমিকার স্পর্শটুকু উপলব্ধি করেছেন। তার মনের মধ্যে যে নিগূঢ় তৃষ্ণা ও আকর্ষণ তা অপ্রত্যাশিতভাবে পরিহাস করেছেন। তার মনে হল প্রেমিকা যেন তার চোখের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত মুখ যেন লজ্জায় পরিপূর্ণ। তার চোটে যেন থরথর করে কাঁপিতেছে। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটিতে বাস্তব জীবন প্রকট সমাজের ঘটনার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের বিচিত্র রোমান্সেরও চিত্র ফুটে উঠেছে অধিকমাত্রায়। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে কিংবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মানবীয় হৃদয়বত্তার জীবনবোধের স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটেছে। তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেম বিষয়ক অনেক উপন্যাস রচনা হয়েছে আগে। কিন্তু বনফুল সেদিক থেকে একটু বাস্তবধর্মী শিল্পী ছিলেন। তিনি প্রেমকে দেখেছেন বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়ে। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে কখনো কখনো তার প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ ধারালো কটাক্ষ উক্তি। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব সচেতনতা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রেমের যে বিবরণ দিয়েছেন তা অবাস্তব উচ্ছ্বাস ভাবতিরেকের যে কল্পনাপ্রবণতা তা অনবহিত নয়।

আলোচ্য ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে আমরা দেখি, কবি পরজন্মে বিশ্বাসী। তাই উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় কবি নিজেকে পরজন্মে বিশ্বাসী রূপে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি তার প্রিয়তমাকে পরজন্মে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। বারবার তার মনে হয়েছে এজন্মে তো অপরের বাগদত্তা। কিন্তু পরজন্মে সে কারো বাগদত্তা হবে না, সে কেবল তার হবে। তিনি ভেবেছেন এজন্মে সে তার ভালোবাসা অগ্রাহ্য করে অন্যের বাগদত্তা হয়ে বসে আছে, সে যেন তাকে একটি চিঠি লেখার প্রয়োজনবোধ মনে করে না। আবার সমস্ত কিছুকে কবি তুচ্ছ করে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন –

“হোক মিছে কথা, কল্পনা হোক, ভেঙ্গো না কভু, ভেঙ্গো না, ভেঙ্গো না, ভুলেরই স্বপন দেখিব আমি।”^৮

তিনি যেন বলেছেন কি অসহায় মানুষের মন। জীবনের মূল্যবান সময়টুকু হারিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। তিনি ভাবছেন এ জীবনে তো তার সাথে আর দেখা হল না। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে যে বিরাজমান তবুও তাকে পাওয়ার যে আশ্বাসটুকু, তা যেন, হারাতে চান না। তাই তিনি বলেছেন –

“তোমারি স্মরণে বাজুক আমার বিরহবাঁশী, ছলনা তোমার, চাহনি তোমার, তোমার হাসি, নানা সুরে মোরে আকুল করুক দিবস-যামী।”^৯

ভালোবাসার সত্য স্বরূপটি যেন ডাক্তারের হৃদয়ে অগ্নান হয়ে রইল। তিনি এই ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের নায়িকাকে দূর থেকে যেন বিরহের সুরে তাকে কাছে যেন পেতে চেয়েছেন। কিন্তু সে পাওয়া ছিল তার জীবনের চরম পাওয়া। কবির এই বিরহের সুরটি যেন সহজেই পাঠকবৃন্দের কাছে স্মৃতিস্বপ্নের এক উজ্জ্বল কাহিনিরূপে প্রেমের ব্যর্থতার কথা ধরা পরেছে। তাই তার ব্যক্তি চেতনার বিচিত্র প্রকাশকেই ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি এই উপন্যাসে নৈর্ব্যক্তিক শিল্পী প্রাণের ব্যঙ্গনাটুকু অভিহিত করেছেন। ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার স্পর্শকাতর নায়িকার প্রেম চূর্ণ হয়ে চলেছে তৃণখণ্ডের শ্রোতের

কঠিন আঘাতে। তবুও ডাক্তার যেন অন্ধকারের মধ্যে উৎকর্ষিত দৃষ্টি মেলে উদ্ভাস্ত প্রেমিকের মতো সামনের দিকে বন্ধনহীন স্বপ্নময়তা নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে বর্ণিত আছে জনৈক ডাক্তারের প্রেমজীবনের দ্বন্দ্ব ও অসুস্থ সমাজের জীবাণুপ্রকট অস্তিত্বের কথা লেখক প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরলেন। বনফুল এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন ‘তৃণখণ্ড’। উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস, ভাব-জীবন, স্বচ্ছ রূপায়ণে, ব্যাধিযুক্ত সমাজ ও চরিত্র-চিত্রণ ও সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ বিকাশ দেখিয়েছেন। সেই সময়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলি থেকে একটু স্বতন্ত্র। বনফুল তাঁর উপন্যাসের নায়কদেরকে দেহের কামনার চেয়ে প্রেমিক হৃদয়ের সুমধুর স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তাদের হৃদয়কে উদ্বেল করেছেন। নায়কের জীর্ণ বাস্তবতার মধ্যে যে স্বপ্ন তা সমাজ-বন্ধন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে দুর্লভ্য বাধাস্বরূপ তা কবি উপন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি কবিতার পথ ধরে লেখক প্রবেশ করেছেন। এবং ধীরে ধীরে খন্ড বিচ্ছিন্ন আকারে সমাজের বাস্তব চরিত্রের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। সুতরাং বনফুলের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্তি অনুভবকে ট্রাজেডির অন্তরালবর্তী বেদনাকে যেন প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের যে পরিচয়, তা ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের অনুভূতির মধ্য দিয়ে তা জীবনের পূর্ণপরিণতি লাভ করে। এদিক থেকে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি ব্যতিক্রমী নয়। উপন্যাসে বর্ণিত সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের বর্ণনা এবং অন্ধ ভরসার মোহজাল। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে দেখা যায় নানা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে তৃণখণ্ডের প্রবাহমান স্রোতে মানুষ ভেসে চলেছে তা লেখক নায়কের মধ্য দিয়ে খন্ডবিচ্ছিন্ন আকারে তুলে ধরেছেন। ডাক্তার চরিত্রকে ঘিরে ব্যাধি ও দারিদ্র্যের হতাশার বীভৎস চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে। তিনি জীবনকে কোনো সংস্কার বা ভাব বিশ্লেষণের আবেগের মধ্য দিয়ে দেখেননি। তিনি বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা সংকটের এই বিনাশক্রান্ত জীবনের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সাধারণ নীচুতলার মানুষের আরোগ্য লাভের অনুসন্ধানের পথ খুঁজছেন। আসলে ‘তৃণখণ্ড’র কাহিনি শিল্পীর ভাবনা-চিন্তার কোনো নিটোল কাহিনি নয়, বরং তৃণখণ্ডের স্রোতে মানুষ ভেসে চলা জীবনের নানা বিচিত্র সংঘর্ষের প্রতিঘাতে মানুষ যে কত অসহায় তাদেরকে কবি পরবর্তীকালে শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়েই একের পর এক সাজিয়ে চলচ্চিত্রের মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে জনৈক ডাক্তার বলেছেন –

“কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা। কতগুলো অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাতে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি তাহা আর কিছুই নয় ফাঁকি।”^{১০}

আসলে এখানে বিবেককে কবি সামাজিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি দেখেছেন সমাজের জীবাণুপ্রকট দুরারোগ্যব্যাধি মুখোশধারী ডাক্তারেরা সমাজে নিঃসহায় মানুষের প্রতি পশুর আচরণ করে ফেরি করে ঘুরেছেন। যেখানে যুক্তির মাধ্যমে সমাজকে পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল, সেখানে সেই শোষণকারী দালালরা পশুর ফর্ম ধারণ করেছে। আসলে মানুষের স্বভাবই এমন বিচিত্র, যতক্ষণ না শোষণকারী ডাক্তারেরা তাদের অর্থ সরবরাহ করেছে। যাহা অন্যায় বলে মনে হবে, সেদিকে মানুষের আগ্রহ বেশি থাকবে। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে দেখা যায় যাদের জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ হলেন তাদের রোগ ছাড়তে না দেখলে কয়েকদিন পর আপনাকে না ডেকে বেশি ফী-ওলা শোষণভোগী ব্যবসায়ী ডাক্তারের কাছে চলে যান। উপন্যাসের নায়ক চরিত্রে দেখা যায়, তিনি সাধারণ অন্ত্যজ মানুষকে ঔষধের পর ঔষধ দিয়েছিলেন। এমনকি রক্ত, মল-মূত্র সবকিছুকে পরীক্ষা করেছিলেন। কোনো সময় হয়তো তিনি রোগ ধরতে পেরেছিলেন আবার কোনসময় ধরতে পারলেন না। কখনো তার দ্বারা রোগ মুক্ত হলো আবার কখনো রোগমুক্ত হল না, সেরকম কয়েকটি খন্ডচিত্রের কাহিনি নিয়ে ডাক্তার চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বনফুল ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে নিজেকে জীবনদর্শন শিল্পী বলেছিলেন। আসলে অসহায় পীড়িত মানুষেরা দুর্বল মুহূর্তে অন্যের প্রতি আশ্রয় নিয়ে তৃণখণ্ডের স্রোতে বৈতরণী পার হতে চায়। তাই ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের চিকিৎসক বলেছেন –

“আমরা অসহায়, নিতান্ত অসহায়। অথচ রোগী মনে করে, আমরা যেন তাহার প্রাণটা পকেটে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের টাকা, খোশামোদ - নানা প্রকার স্তুতি করিয়া চলিয়াছে সে।”^{১১}

আসলে মানুষ যখন গভীর জলে ডুবে যায় তখন তৃণখণ্ডের উপর হাত বেড়ে বেঁচে থাকার আশ্রয় চেষ্টা করে। ঠিক তেমনি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষই বেঁচে থাকার জন্য অন্ধ ভরসার আশ্রয় নিয়ে ডাক্তারের কাছে হাত বাড়ায়। জীবন-মৃত্যুর এই

সংকটপূর্ণ সমাজে কেহ তীব্র লড়াই করেছে তৃণখণ্ডে হাত বাড়িয়ে বেঁচে থাকার জন্য আবার কেহ জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে নিরুপায় হয়ে বৈতরণীর জলে আত্মহনন করেছে। এছাড়া লেখক বনফুল নিজেই অভিব্যক্ত করেছেন ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে - মানুষ যেন তার জীবন পরিণতির জন্য দুরারোগ্যব্যাধি। কারণ দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার আড়ালে লুকিয়ে আছে বীজাণুপ্রকট মুখোশধারী অসুখী সমাজ। সময় ও সুবিধা দেখে নিজের ভদ্রহীন মুখোশের পরিচয় দেয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই সমাজের জন্য তাদের দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। বনফুল সাধারণ মানুষের জীবনকে কোনো প্রথাগত রীতি বা ভাবাবিষ্ট আবেগের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। বরং তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে এক সংস্কারমুক্ত মোহাবেশ বর্জিত ব্যাধিমুক্ত সমাজ। মানুষ যখন দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় আরোগ্য লাভের আশায় তৃণখণ্ডের শ্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র উপায় অবলম্বন করেছেন ডাক্তারদেরকে। তখন লেখক বনফুল তার নৈর্ব্যক্তিক শিল্পীমনের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন করেন। তিনি এই তৃণখণ্ডের শ্রোতে ভাসমান সাধারণ মানুষদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পস্থা অবলম্বন করে নায়ক ডাক্তারকে চিত্রায়িত করলেন। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের নায়ক অসুস্থ মানুষের আশ্বাস দেওয়ার জন্য ‘বিনা ফীতে’ কখনো দেখেননি কারণ কোনো রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা যদি করে থাকেন পরের দিন তৃণখণ্ডের মতো ডাক্তারের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তাই লেখক তৃণখণ্ডের নায়ক ডাক্তারের মুখে বলেছেন

“বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয় না। ওটা একটা সস্তায় নাম কেনবার উপায় - আহা, অমুক ডাক্তার দয়ার অবতার। কিন্তু আশ্চর্য, অসুখ একটু শক্ত হলেই লোকে ‘অবতার’-কে ত্যাগ করে চামারের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মনুষ্য ধর্ম।”^{২২}

লেখক বনফুল নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে অসুস্থ এই পৃথিবীর ব্যাধিমুক্তহীন সমাজের আরোগ্য লাভের আশ্বাসবাণী নিয়ে উপন্যাসে উপস্থিত করলেন। কারণ ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে স্পষ্ট দেখা যায় মানুষ যেন তার জীবন পরিণতির জন্য দায়ভাগী। সুতরাং মানুষ অকৃতজ্ঞ নয় কিন্তু তাদের চরিত্রের স্বভাব দুর্লভকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। যা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সেটার মর্ম না বুঝিয়ে অসীমের সন্ধানে জীবনকে বিলীন করে দিয়েছে। কারণ মানুষ নিজের আপন স্বভাবের জন্য শোষিত হচ্ছে এই হোমরা-চোমরা ডাক্তারদের কাছে। সেই রকমই একটি চরিত্র লেখক উপন্যাসে বর্ণিত করেছেন। একটি ছেলেকে তিনমাস ধরে জ্বরে ভুগছে দেখে ডাক্তারের মনে করোনার সন্দেহ হয়েছিল। দরিদ্র অসহায়তা ভেবে তাকে বিনা পয়সায় ওষুধ কিনে চিকিৎসা করলেন। কিন্তু পরিনাম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। সে তার মনুষ্যধর্মের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে দুটো ইনজেকশন নিয়ে কবরেজের কাছে আরোগ্য লাভের আশায় আশ্রয় নিয়েছে।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে জনৈক ডাক্তারের জীবনের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে খন্ড বিচ্ছিন্ন চরিত্রের মধ্যে একটি হল উকিলবাবু। উকিলবাবু ডাক্তারের কাছে এসে চশমা মুছে মুছে ফুলহাটির নন্দ মিত্তিবাদের কথা বললেন। তিনি ডাক্তারকে বলেছিলেন আজকাল নন্দমিত্তির গরীব হয়ে দুরারোগ্যব্যাধি অসুখে ভোগছে। কোনোভাবেই ছাড়ছে না। এমনকি সে অনেক চিকিৎসা করেছে ডাক্তারি থেকে শুরু করে কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমি পর্যন্ত করেছে আরোগ্য লাভের কামনায়। কিন্তু কোনো কিছুতেই তাতে রোগমুক্ত হল না। তারপর সে ডাক্তারকে বলেছিল আপনি যদি করুণা করে দারিদ্র্য এই নন্দ মিত্তিরের চিকিৎসার ভারটা নিন তাহলে কৃতজ্ঞতাবোধ হবে। তখন ডাক্তার তীর্থক কণ্ঠে বলেছিলেন -

“আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করতে হলে ফী লাগবে।”^{২৩}

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের লেখক তার ধারালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিক্ষেপ করলেও সে হৃদয়হীন নয়। বরং আদর্শবাদী জনৈক ডাক্তার সাধারণ মানুষের আরোগ্য মুক্তির উপায় অবলম্বন করে তাদের অন্ধতার ভরসার নিরিখে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফী নিয়ে চিকিৎসা করেছেন। কারণ ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে চিকিৎসক নিজেই বলেছেন যদি টাকা না নিয়ে চিকিৎসা করেন হয়তো এই যুক্তি মার্জিত বিবেক সমাজে তাকে আর কেউ ডাকবে না। আবার কেউ যদিও ডাকে তাকে এবং অর্থ না নিয়ে চিকিৎসা করেন হয়তো সে যা করণীয় রূপে বলতে তা অস্বীকার করে আগ্রহী হবে না। তাই এই অসুখী ব্যাধিপীড়িত সমাজে অর্থহীন প্রেসক্রিপশন যদি লিখে দেন তার উপর অগ্রাহ্য না করে তৃণখণ্ডের শ্রোতে বৈতরণী পার হওয়ার নতুন প্রকল্প ধারণ করবে।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগের বিবরণ পাওয়া যায়। কখনো দেখা যায় দাঁতে ব্যাথা, কখনো টাইফয়েড আবার কখনো দেখা যায় যক্ষা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, বেরিবেরি রোগের শেষ নাই। এমনকি কখনো দেখা যায় অনেক রোগী মানসিক অশান্তিতে ভোগছেন। এছাড়া দেখা যায় অনেক বড় বড় লোকের অসুখের কারণ হল টাকা। এভাবেই লেখক বনফুল বিভিন্ন রোগের বর্ণনা দিয়ে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের আদলে বাস্তব আজন্ম রুগ্ন পৃথিবীর জীবনদৃষ্টি বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই উপন্যাসে দেখা যায় নানা দুরারোগ্যব্যধি বিচিত্র কাহিনির প্রভাবে মানুষ আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত পশুর সহজ পস্থা অবলম্বন করেছে আরোগ্য নিকেতনের আশ্বাসে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই পশুতাড়িত বিচ্ছিন্ন রূপের আবরণে লেখকের স্ববিরোধ মনোভাবটি স্পষ্ট ভাবে ধরা পরেছে –

“বাহিরে আমি এত ভদ্র - অথচ ভিতরে আমি এত বর্বর। সেই আদিম যুগের কেভ-ম্যান আজিও আমার মধ্যে বাঁচিয়া আছে। সভ্যতার সমস্ত চেষ্টাই তো সে পণ্ড করিয়া দিতেছে। নীতিকথা বলিয়া কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না।”^{১৪}

অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সমাজ পরিবেশের আড়ালে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষেরা পশুর প্রতীকি অবলম্বন করে আরোগ্য লাভের কামনা করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় বংশীবাবুর রোগ নিরাময়ের জন্য আদিম প্রবৃত্তির পস্থা অবলম্বন করে ছাগলের ব্যবহার করেছেন। আবার নগেনকে যখন ডাক্তার দেখতে গেলেন তখন নগনের ঘরে একটা বড় ষাঁড় ঢুকতে দেখলেন। কেননা এরকম মূমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর পাশে যদি ষাড়কে দিয়ে গৌ-দান করা হয় সে নাকি বৈতরণী পার হতে পারবে। তাই লেখক এই উপন্যাসে মানুষের বাইরের ভদ্রতার প্রভাবে তিনি এরকম আদিম ক্যাভম্যান প্রবৃত্তি তাড়িত উলঙ্গ পশুকে সমাজে উদগ্রীব হওয়ার ফলে তিনি বিরোধ করেছেন। এখান থেকে স্পষ্ট বলতে পারি, আমাদের সমাজকে লেখক যেন ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে নায়কের ডাক্তারি পেশার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাস্তব ব্যাধিযুক্ত পরিবেশ তুলে ধরলেন। আপাততভাবে বনফুলের ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসটি উদ্ভট রচনা হলেও প্রথমেই তিনি ভাসমান জীবনের চিত্ররূপ অংকন করে শিল্পীচেতনার প্রেরণাকে প্রতিফলিত করেছেন। সভ্যতার উন্নতি প্রযুক্তিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্র যতই আবিষ্কার হোক না কেন এখনো আমাদের সমাজ অনেক পিছিয়ে আছে অন্ধ ভরসার কুসংস্কারকে নিয়ে। মানুষ যতদিন পর্যন্ত অন্ধ ভরসার কুসংস্কার থেকে আপন ভাগ্যকে জয় করে নিতে সক্ষম হবে না, ততদিন পর্যন্ত মানুষ মুখোশধারী অসুখী সমাজের ভদ্রতার স্রোতে বিচূর্ণ হবে প্রতিনিয়ত।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে সমাজজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অবলম্বনে একান্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলেখ্য নায়ক চিকিৎসকের সঙ্গে সঙ্গে সব চরিত্রকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আজন্ম রুগ্ন সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বমুখরত আরোগ্যহীন সমাজে অনাগতকালের উদ্দেশ্যে একটি আশার উজ্জীবন নিয়ে ‘তৃণখণ্ড’র চরিত্রগুলির পাশে নায়ক ডাক্তার চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং কালের প্রবাহে তার ব্যক্তিগত জীবন চেতনার অভ্যন্তরে যে আশার প্রত্যয়বোধ আক্ষেপ অপ্রতিরোধ্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিল তারই আলেখ্যে অসুস্থ এই সাধারণ মানুষদের মুক্তির আগ্রহ নিয়ে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে রূপায়ণ করেছেন। উপন্যাসের ডাক্তারকে ঘিরে কয়েকটি চরিত্র হল - হরিশবাবু, পাঁচুগোপাল বসাক, মহিন্দর, নরেন, প্রাণকৃষ্ণবাবু, সনাতনবাবু, ভজুয়া, নগেন, বিধবা রানীজী, কুঞ্জলাল, কারো গোয়ালা, ম্যানেজার সর্বেশ্বরবাবু, ঝাকড়াভূরু, কাবুলিওয়ালা, মাড়োয়াড়ী, হারানদা, উকিলবাবু, ফুলহাটির নন্দমিত্তির, এজেন্ট ভদ্রলোক, রামবরণ সিং, ফুলহাটির মিত্রবংশের বংশীমিত্র এবং রংবাজারের আসমানী প্রভৃতিকে ঘিরে জনৈক নামক চিকিৎসক চরিত্রটি সার্থক করে তুলেছেন।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে নায়ক ডাক্তারকে ঘিরে প্রথমে দেখা যায় হরিশবাবু। সে দরিদ্র কিন্তু বিগত যৌবন লাভের আশায় সর্বদা উৎসাহী। তার অনেকগুলি সন্তান বরং তাদেরকে প্রতিপালন করে বড় করার সাধ্যটুকু প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এই বিড়ম্বিত বিচিত্র জীবনে বৃহৎ সংসারের মধ্যে নিপিষ্ট সে। তবুও সে নবযৌবন লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নায়ক ডাক্তারের কাছে আসে সে। সুতরাং তার মনের মধ্যে কামুক প্রবঞ্চনা উত্তপ্তরূপে জ্বলছে। আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য তা-

ও বিশেষ পরিস্থিতিতে কারও মনে আলোড়ন আনতে পারে। এই উপন্যাসের ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে চেনামহল থেকে আরেকটি চরিত্র হল পাঁচুগোপাল বসাক। বৃদ্ধ পাঁচুগোপাল বসাকের দশ বছর আগে গনোরিয়া হয়েছিল। যার জন্য তার স্ত্রী সন্তানহীনতার অভাবের জন্য আজ উন্মাদিনী। কিন্তু সেই সন্তানহীনতার অভিধানে উন্মাদিনী স্ত্রী শেষপর্যন্ত নিরুৎসাহিত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাগ্রস্ত পাঁচুগোপাল বসাক কিশোরী মেয়েকে আবার বিবাহ করল। কিন্তু বিয়ের পূর্বে পাঁচুগোপাল বসাক ডাক্তারের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিল সে যেন পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করে। প্রৌঢ় প্রাণকৃষ্ণবাবু ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন ভাগ্নের জ্বরের চিকিৎসা করানোর জন্য। আবার নায়ক ডাক্তার যখন প্রৌঢ় প্রাণকৃষ্ণের ভাগ্নের অসুখের খবর পেয়ে চিকিৎসা করার জন্য তার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখনই দেখলেন বৃদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ পাশের বাড়ির মেয়ের প্রতি তীব্র আসক্ত। কিন্তু সর্বদা তার মনের মধ্যে এক উদ্ভট বিকৃত চিন্তার ভাব ভঙ্গি দেখা যায়। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ধারণা ছিল পাশের বাড়ির এই তরুণী মেয়েটি যেন তার প্রেমে আকুল। বরং প্রাণকৃষ্ণই এই মেয়েটির প্রতি অনুগ্রাহীপ্রার্থী ছিলেন। রোগী দেখে যখন চিকিৎসক বাড়ি ফিরছেন তখন দেখলেন কাগজে মোড়া কতকগুলি চুল প্রাণকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মতো খুলে ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন –

“বড় বেরসিক লোক আপনি! ইংরেজি নভেলে পড়েননি আপনি, মেয়েরা তাদের প্রণয়ীকে চুল উপহার দেয়? এ তাই।”^{১৫}

অর্থাৎ কামুক এই প্রাণকৃষ্ণই পরস্পর প্রেমে ব্যাধিগ্রস্ত। ঘরে শক্ত অসুস্থ রোগী রেখে তমিস্রার নির্জন গলিতে প্রণয়ের সন্ধানে বেড়িয়েছেন। এছাড়া উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় কারুগোয়ালার স্ত্রী আর্তনাদ করে ডাক্তারবাবুকে বলেছে –

“ওগো ডাক্তারবাবু এত দেরী করে কেন এলে গো, আমার বাছা যে চলে গেছে।”^{১৬}

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে দেখা যায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আছে প্রিয়জনকে হারানোর অন্তহীন বেদনা। কারু গোয়ালার সন্তানকে দেখার জন্য ডাক্তারবাবুর দেরি হওয়ার ফলে তার স্ত্রী সন্তানের মৃত্যুর শোক প্রকাশ করেছে ডাক্তারের কাছে। আসলে মানুষ অন্ধ ভরসার আশ্রয়ে ডাক্তারের কাছে হাত বাড়িয়ে জীবনের বেঁচে থাকার প্রেরণা করেছে। তাই তারা বেঁচে থাকার জন্য তৃণখণ্ডের সাহায্য নিয়েছে। হারানদার স্ত্রী যক্ষা থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার আকুল আগ্রহ। কিন্তু সে যে বাচিবে না, একথা জেনেও তাকে জনৈক ডাক্তার প্রতিদিন আশ্বাসবাণী দিয়ে আসেন, সে দ্রুত ভালো হয়ে যাবে। এছাড়া রোগাগ্রস্ত বংশীবাবুর বাড়িতে চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারকে প্রতিদিন যেতে হত। বংশীবাবুর রোগ ছাড়বে না জেনেও ডাক্তারকে রোজ চিকিৎসা করতে যেতে হয়েছিল। তিনি যখন উকিলবাবুকে বলেছিলেন কবিরাজ চিকিৎসা যেভাবে চলছে সেভাবে করানোর জন্য। কিন্তু উকিলবাবু নায়ক ডাক্তারকে বলেছিলেন –

“আপনার ওপরই আমাদের ফেথ বেশি।”^{১৭}

অর্থাৎ এই সাধারণ মানুষেরাই অন্ধভরসার আশ্রয় নিয়ে ‘তৃণখণ্ড’র স্রোতে ডাক্তারকে আশ্রয় ধরে বেঁচে থাকার জন্য আকুল আগ্রহ কামনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বংশীবাবুর পরিবারে বৃদ্ধমাতা, স্ত্রীও চাকরদের নিয়ে তার সংসার ছিল। সে আজীবন কৌমার্য পালন করে পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দেয়। যে সময়ে রোগে আক্রান্ত হল নিজের বংশ রক্ষার জন্য মায়ের অনুরোধে বিবাহ করে নিল। এছাড়া নানা কুসংস্কারের প্রবণতা দেখা যায়। রোগে তাড়ানোর জন্য ছাগলের পোষ ব্যবহার। তারপর মৃত্যু পথযাত্রী বংশীবাবুর মৃত্যু হওয়ার পর দারিদ্র্যপীড়িত এই সংসারে শেষ পর্যন্ত স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল। তার দারিদ্র্য সংসারে স্বামীর চিকিৎসায় সব বিসর্জন করে ফেলল। আবার যখন তাকে রক্ষা করা হল তখন বলল সে –

“এ কি! আমি তাহলে মরিনি? কেন আমাকে তুললেন আপনারা? আমার জীবনে কি আছে, যার জন্যে আমি বাঁচবো?”^{১৮}

আলোচ্য ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে দেখা যায় তাকে আত্মরক্ষা করে কবির মনে যেন অপরাধীর ভাবনা জাগলো। তিনি ভাবলেন তাকে বাঁচিয়ে কি কোনো ভুল হল।

‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে ডাক্তারের চোখে দেখা আরেকটি চরিত্র হল মারোয়াড়ী। মারোয়াড়ী চরিত্রটি ধাতু ও দৌর্বল্য। ডাক্তারের কাছে যখন সে চিকিৎসা করতে আসে সঙ্গে এক বাঙালি প্রেসক্রিপশন ছিল। সে অনেক চিকিৎসা করেছে। এমনকি দিল্লির হাকিম থেকে শুরু করে ছোট-বড় অনেক চিকিৎসকের কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ করেছে। কিন্তু

কোনো কিছুতেই আরোগ্য লাভ হল না। যখন সে উপন্যাসের নায়ক ডাক্তারের কথা শুনলো তখন তার কাছে বেঁচে থাকার আশাহত স্বপ্ন নিয়ে চিকিৎসা করতে আসে। তারপর ডাক্তার তাকে সামান্য হজমের ঔষধ লিখে দেওয়ার পর মারোয়াড়ী চলে গেল। এই উপন্যাসে আসমানী চরিত্রকে ঘিরে লেখকের ব্যঙ্গ বিদ্রোপের আভাস দেখা যায়। আসমানী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় ডাক্তার তাঁকে অবহেলার সহিত একটি প্রেসক্রিপশন লিখে একটা টাকা দিয়েছিলেন। তারপর কয়েকদিন পরে এসে ডাক্তারবাবুকে বলেছিল আপনার ঔষধ খেয়ে আমার আরোগ্য লাভ হল। তখন জনৈক ডাক্তার হতাশার সহিত অভিভূত হয়ে ভাবলেন যাকে তিনি অবহেলাভরে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন সে তার কদর্য করে রোগ থেকে মুক্তি পেল। তারপর ডাক্তারবাবু ভাবলেন যে প্রায়ই মৃত্যুশয্যা শরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিল তার ভিতরে আলো জ্বলে দিয়ে এমন এক মোহিনী অগ্নিশিখাকে এই ব্যাধিযুক্ত অসুস্থ সমাজে তাকে ছেড়ে কি উপকার করেছেন। এছাড়া বিধবা রানীজী সম্পত্তির অধিকারিণী নিজের ভ্রূণ হত্যার প্রাণঘাতী পীড়া তাকে কাতর করেছে। সে নিঃসন্তান বিধবা যুবতী। অথচ লেখক বলেছেন সমাজ যাকে চায় না, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে কে? আলোচ্য উপন্যাসে নগেন সম্পর্কে ডাক্তার বলেছেন –

“চিরকাল তাহার যুক্তিটা এইরূপ যে, ইহা তোমার ব্যবসায়। আমি তোমার বন্ধু বলিয়াই বিশেষ করিয়া তোমাকে ফী দেওয়া কর্তব্য, কারণ আমি তাহা দিতে এখনও সক্ষম।”^{২৬}

যখন নগেন অসুস্থ হয়ে পড়ে উপন্যাসের ডাক্তার সমস্ত কিছুকে ছেড়ে মতিহারীতে তাকে দেখতে গেলেন। অন্য কোনো উপায় না পেয়ে নগেনের চিকিৎসার জন্য বিপুল বর্ষাষ ডাক্তারকে যেতে হল। উপন্যাসের আরও একটি চরিত্র হল এজেন্ট ভদ্রলোক। ভদ্রলোক যখন ডাক্তারের কাছে ঔষধের স্যাম্পল নিয়ে আসে তখন ডাক্তার অগ্নিমূর্তি রূপ ধারণ করে বললেন-

“দেখুন ওসব ডাক্তারের নাম বেশি করবেন না আপনারা আমাদের কাছে। তাহলে আপনাদের ঔষুধের প্রতি যা-ও আমাদের একটু শ্রদ্ধা আছে কমে যাবে।”^{২৭}

অর্থাৎ ভদ্রলোক যখন নামজাদা ডাক্তার কয়েকজনের নাম বলেছিলেন তখন জনৈক ডাক্তার চরিত্রটির সর্বাপেক্ষা জ্বলে ওঠে। তিনি বলেছিলেন কলকাতার নামজাদা পেশাদারী যেসব ডাক্তার তারা সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের আতর্নাদ ও রোগীর ভালো-মন্দ বিচার সম্পর্কে তারা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা করে। লোভী ডাক্তারেরা সামান্য কিছু অর্থের নোভে রোগীর ভালো-মন্দ বিচার না করে যখন যে ঔষধের বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকেন পরিণতির বিচার না করে সঙ্গে সঙ্গে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। এরা সবসময় সাধারণ মানুষকে শোষণ করে মৃত্যুর পথে টেলে দিয়েছে। কিন্তু বনফুল বলেছেন প্রকৃত যে ডাক্তার সাধারণ মানুষের সেবায় নিজের জীবনকে আত্মত্যাগ করেছেন। তাই কবি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে দেখতে চেয়েছেন। অর্থের লোভে যেসব ডাক্তারেরা সাধারণ মানুষের জীবনকে মৃত্যুশয্যা শরণাপন্ন করেছে ওই কালোবাজারী ব্যবসাদার, দালাল, বুদ্ধিমান, ধনবান ব্যক্তিগণকে তিনি কখনো শ্রদ্ধা করতে পারবেন না। আসলে মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যা অসীম তাকে পাওয়ার চেষ্টা করা। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসের ডাক্তার বলেছেন –

“রোগ যদি দুঃসাধ্য হয়, রোগীর যদি পয়সা এবং বিশ্বাস থাকে আমরা তাকে তার বিশ্বাস অনুসারে চলতে বাধা না দিয়ে তাকে কোনো বড় ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়ে আসি। মরা-বাঁচাকে কিসে মরে, কে কিসে বাঁচে, জানি না।”^{২৮}

প্রসঙ্গত বলা যায়, ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে দেখা যায়, সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতা লেখক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। কেহ যক্ষা রোগে আক্রান্ত, কেহ ম্যালেরিয়া, কেহ গনোরিয়া আবার কেহ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। এমনকি ডবল নিমোনিয়া আক্রান্ত অসুস্থ ছেলের পিতা নয়নবাবুকে ডাক্তার যখন বলেছিলেন তার থাকা এখানে বৃথা ততোই নয়নবাবুর ডাক্তারের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তার এই করুণ মিনতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অবশেষে ডাক্তারকে থাকতে হল। আবার এজেন্ট ভদ্রলোকটি ডাক্তারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল দারিদ্রতার কারণে পেটের দায়ে তাদের মতো অসহায় যুবকদের চাকরি করতে হয় সর্বদা। ভালোমন্দের বিচার আপনাদের মতো ডাক্তারেরা জানে। তবে এটা বলা যায় এতদ্বারা ঔষধ বিক্রি করতে না পারলে তাদের মতো অনেক অসহায়দের চাকরি যেতে পারে। তখন ডাক্তার এই ভদ্রলোকটির ভিতর দেখলেন –

“চকচকে সুটের ভিতর হইতে সহসা দীন-দরিদ্র বাঙালিমূর্তি আত্মপ্রকাশ করল।”^{২৯}

তারপর লেখক কোনো কিছু না বলে ‘তৃণখণ্ড’র আত্মসাবাণী দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। আসলে আমরা আমাদের দীন-দরিদ্র বাঙালি সমাজে উচ্চশ্রেণির শোষণের বৈষম্যের শিকার হয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে ফেলেছি। এভাবেই লেখক জনৈক ডাক্তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার প্রাত্যহিক জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ করলেন। তিনি একান্ত নিজস্ব বাস্তব চিকিৎসকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে মানুষের পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তৃণখণ্ডের স্রোতে ডাক্তারের অন্ধ ভরসার আশ্রয় নিয়ে ভেসে যেতে দেখেছেন। কখনো মানুষের উত্থান-পতন আবার কখনো জীবন-মৃত্যুর কড়াল বিভীষিকায় মানুষকে একে অপরকে রক্ষা করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক সরোজ মোহন মিত্র বলেছেন –

“সংসার সমুদ্রের বিচিত্র ঘটনাস্রোতে আমরা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে চলেছি। ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষের সেই অসহায়তার কতকগুলো বেদনার্ত চিত্র বনফুল ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কাহিনীসূত্রে একত্র করেছেন ডাক্তার এবং তার জনৈক পরস্পরী প্রতি প্রেমাকুতি।”^{২৩}

এটাই স্পষ্ট বোঝা যায়, বনফুলের ‘তৃণখণ্ড’টি গদ্যে-পদ্যে লেখার ভঙ্গিমার ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমালোচকদের ভাবনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেবল লেখক বনফুল মানুষের বিড়ম্বিত জীবন নয়। শিল্পী যেন তার ব্যক্তিগত জীবনে সংসার সীমান্তে অসহায়তাবোধকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। বরং মূল ডাক্তার চরিত্রের সঙ্গে খন্ড বিচ্ছিন্ন কিছু চরিত্রকে লেখক বনফুল চরিত্রের পর চরিত্র সাজিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের মধ্যে। তাই লেখক বনফুল শিল্পীপ্রাণের আন্তরিকতাবোধের দ্বারা ‘তৃণখণ্ড’র চিকিৎসক চরিত্রকে সুকোমল হৃদয়ের তীক্ষ্ণ-ধারালো স্বভাবের আদর্শবাদী সার্থক নায়ক রূপে অভিহিত করলেন। ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন মানুষ তার জীবনের পরিণাম জেনেও তাকে লংঘন করে নীতিহীন অধঃপতনের চূড়ান্ত মুহূর্তে না মেনে দ্বিধাহীন যাত্রা করেছে তৃণখণ্ডের স্রোতে। এর জন্যই লেখক উপন্যাসের শেষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন –

“এই তো জীবন, আজ আছে কাল নাই।”^{২৪}

বলাবাহুল্য, এ সমস্ত বিশ্বাস সংস্কার সবই যেন লেখক আপন জীবন মস্তনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা লেখকচিত্তের যে জীবনসংকট থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারবে না, মুক্তির সেই আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি নিয়ে গেছেন তৃণখণ্ডের হাত বাড়িয়ে। অন্ধ সংস্কারের প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি কতখানি নিচেঁষ্ট হতে পারে তা বনফুল চিকিৎসক চরিত্রের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ‘তৃণখণ্ড’ উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

Reference:

১. মিত্র, ডঃ সরোজমোহন, ‘বনফুলের সাহিত্য ও জীবন’, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১২, পৃ. ২০৬
২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’ (১ম খণ্ড), নিউবেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, পৃ. ৪
৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, তদেব, পৃ. ১
৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৪১
৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৪, ৫
৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৬
৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ১৬
৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৫০
৯. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৫০
১০. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ২৯
১১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ২৯
১২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩৪
১৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩২

-
১৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ১৫
 ১৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ১২
 ১৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩২
 ১৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩৭
 ১৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৪১
 ১৯. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'তিনকাহিনী', কলকাতা-৯
 ২০. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩৫
 ২১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩৫
 ২২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৩৫
 ২৩. নিয়োগী, শর্মিষ্ঠা, 'বনফুলের উপন্যাস গঠন ও শৈলী বিশ্লেষণ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৪২১ পৃ. ১৪
 ২৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), তদেব, পৃ. ৫২